বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৯/৪০ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৮/১৪২৯

উচ্চশিক্ষার অকূল পাথার: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

গোলাম নবী মজুমদার*

১। ভূমিকা

সংখ্যায় বেশি হলে প্রায়শই অনেক সুবিধা মেলে: দলে ভারী হয়, ভোটে জেতা যায়, শক্তিতে বলীয়ান হওয়া যায়। কিন্তু সংখ্যায় বড় হলেই যে তা গুণে-মানে বাড়বে, তার নিশ্চয়তা নেই। গুণগত মান সব সময় সংখ্যায় মাপা যায় না। গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য তাই প্রয়োজন হয় শক্তির বিচার, নিক্তি নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আকারে দেশের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়; দেশের সর্বত্র বিস্তৃত এর অবস্থান। আকারের মতো, মানেও কি সেরা এই প্রতিষ্ঠান? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল আমলের শিক্ষার গুণ ও মানের শক্তির বিচার করা এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিষয় শুরুতে উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত, এটি দেশের উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় গুচ্ছ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ২০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত মোট ২,৩০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।[১] এর মধ্যে কেবল ২৭৫ টি সরকারি আর বাকি সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য, দেশের সবচেয়ে বড় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সর্বমোট মাত্র ৩৭,০১৮ জন।[২] দ্বিতীয়ত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত কম আয়ের পরিবার থেকে আসে। যেমন Hossain প্রমুখ (2017) তাদের গবেষণায়[৩] দেখিয়েছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর পরিবারের মাসিক আয় ৩,০০০-১২,০০০ টাকা, ৫৬ শতাংশ শিক্ষার্থীর পরিবারের মাসিক ব্যয় ২,০০০-৭,০০০ টাকা এবং ৬৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর বাবা পেশায় কৃষক। তৃতীয়ত, এই ধরনের কম আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার একমাত্র ভরসা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে তরুণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আর এ শিক্ষার্থীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দরিদ্র পরিবারের সদস্য এবং নাগরিক (কিংবা আধুনিক) সুযোগ-সুবিধা থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সুন্দর সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য অনস্বীকার্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুব সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের ঠাঁই হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঠাঁই নেয়ার বা চাওয়ার জায়গা দেশে খুব বেশি নেই; যাও বা আছে তাতে নিজের নাম যোগ করা দুঃসাধ্য! কারো কারো জন্য সোজাসাপ্টা অসাধ্য। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেই যুব সমাজের পরিত্রাণ চাওয়ার বা পাওয়ার

---

* রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

[১] http://www.nu.ac.bd/nu-at-a-glance.php (জানুয়ারি ২৬, ২০২২)।

[২] https:/ /www.du.ac.bd/main_menu/the_university/du_at_a_glance (জানুয়ারি ২৬, ২০২২)

[৩] এই গবেষণার ফলাফল হয়তো এখনকার বাস্তবতা থেকে কিছুটা ভিন্ন, কিন্তু এতে অন্তত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মোটা দাগে কী ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে আসে তার একটা চিত্র পাওয়া যায়।

ভরসার নাম; অন্য কথায় সবেধন নীলমণি। কিন্তু সেই আশা হয়তো দূরাশায় পরিণত হয় অচিরেই, কারো কারোর কাছে অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে গবেষণা অপ্রতুল। Alam, Mishra, & Shahjamal (2014) এক নিবন্ধে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের করুণ অবস্থা তুলে ধরেন। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত অনেক বেশি, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা শোচনীয়; শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পরীক্ষা বা মূল্যায়ন করা হয় না; যে কয়জন শিক্ষক আছে তাঁদের এত বেশি ক্লাস ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে হয় যে তাঁরা শিক্ষার্থীদের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার ন্যূনতম অবকাশ বা সুযোগ প্রায়ই পায় না; যে ধরনের বই, জার্নাল তারা পড়তে পারেন বা পড়তে বলতে পারেন সেগুলো অনেকাংশেই অপ্রাসঙ্গিক, অনেক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ বিদ্যমান; শিক্ষকদের হাল আমলের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে জানার বা চর্চা করবার সুযোগ নেই বললেই চলে; শিক্ষক ও অন্যান্য স্টাফদের বিশেষ করে ২,০০০ এর বেশি বেসরকারি কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের অনেকেরই বেতন কম, যা দিয়ে সম্মানজকভাবে জীবনযাপন করা দুঃসাধ্য। তারপরও, এই চাকরি পাওয়ার জন্য অনেককেই মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়, বিশেষ করে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য; শিক্ষার মান যাচাই বা পরীক্ষার ব্যবস্থা তথৈবচ; শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দুই পক্ষই কিছু গৎবাঁধা প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং সেসব প্রশ্নই পরীক্ষায় আসে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার গুণমান বজায় থাকাতো দূরে থাক, এই ধরনের উচ্চশিক্ষার প্রতি বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা থাকার বিশেষ কি কারণ থাকবে? কিংবা ভালো কিছু প্রত্যাশা করার, আশাবাদী হওয়ার কি যৌক্তিক কারণ থাকবে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর Mahmud প্রমুখ (2019)[৪] পরিচালিত এক গবেষণা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় গুণগত (Qualitative) যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। উক্ত গবেষণার পরিমাণগত (Quantitative) গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ইতিমধ্যে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তার সাথে রিপোর্টের গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত এই লেখা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়।

১.১। গবেষণার উদ্দেশ্য

শুধু আজকের বাংলাদেশ নয় আগামী কয়েক দশকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি যত ত্বরান্বিত হবে এবং দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন বা চাহিদা বাড়বে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা তত বেশি অনুভূত হবে। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি এই যুগসন্ধিক্ষণে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত? এই প্রতিষ্ঠান কাঠামোগত ভাবে কতটা উপযুক্ত, কতটা গণবান্ধব, কতটা যুগোপযোগী সেটাই যাচাই করা হয়েছে এই নিবন্ধে। শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা আছে কি? বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা কি শ্রমবাজারে বিদ্যমান চাহিদা পূরণে সক্ষম? বিশ্ববিদ্যালয়টি কি বর্তমানে কোনো একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলে? ক্লাস ও পরীক্ষা সময়মতো নেয়া সম্ভব হয়? ক্লাস

[৪] উক্ত গবেষণায় সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে এই নিবন্ধ প্রকাশের সম্মতি প্রদানের জন্য সমীক্ষা পরিচালক মিনহাজ মাহমুদের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ। গবেষণা দলের সকল সদস্যের সহযোগিতা না পেলে কাজটা সুষ্ঠুভাবে শেষ করা দূরূহ হতো।

ও পরীক্ষা নেয়ার মতো রুম বা স্বতন্ত্র পরীক্ষার হল আছে কি? শিক্ষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কি? ল্যাবরেটরি বা সেমিনার রুমের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে কি? বই, জার্নাল ও গবেষণা সরঞ্জামাদি পর্যাপ্ত আছে কি? থাকলে তা ছাত্রছাত্রীরা সুবিধামতো ব্যবহার করতে পারে কি? ক্যাম্পাসে কিংবা ঘরে বসে রিমোট এক্সেসের মাধ্যমে সবাই ইন্টারনেটে প্রয়োজনীয় কাজ সারতে পারে কি? প্রবন্ধে এই সমস্ত বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে। পরিস্থিতির উন্নয়নে কিছু সুপারিশও পেশ করা হয়েছে।

২। গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ জন্য গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সম্ভাব্য চাকরিদাতাদের মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উত্তরদাতা বাছাই করা হয়েছে। তবে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে দেশের সাতটি বিভাগ থেকে। শুধু যারা গবেষণা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থী ছিল তাদেরকেই নির্বাচন করা হয়েছে। দলীয় আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের কলেজের, যেমন সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মহিলা কলেজের ছাত্রীদের বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেন, নারী পুরুষের অংশগ্রহণ সমান হয়। শিক্ষার্থীদের নিয়ে ৬টি এফজিডি এবং শিক্ষকদের নিয়ে ৫টি এফজিডি করা হয়েছে। এছাড়া ১৫ জন নির্বাচিত শিক্ষককে নিয়ে কেআইআই বা কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ পরিচালনা করা হয়েছে। শিক্ষকদের এফজিডি বা দলীয় আলোচনায় বিজ্ঞান, কলা, ব্যবসা বিভাগের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিনিয়র অধ্যাপক, মাঝারি পর্যায়ের ও প্রারম্ভিক পর্যায়ের শিক্ষকদেরও দলীয় আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি দলীয় আলোচনায় কমপক্ষে ৫ জন অংশ নেয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর ও বিভাগের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৯ সালের জুলাই মাসের ১৮ তারিখে ঢাকার বিভিন্ন কলেজের মোট ২১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ২টি দলীয় আলোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণায় সম্ভাব্য চাকরিদাতা হিসেবে ২০১৯ সালের জুলাই আগস্ট মাসে মোট ১৫ জনের কেআইআই করা হয়েছে। এই সম্ভাব্য চাকরিদাতাদের ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগ থেকে বাছাই করা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে প্রতিনিধি বেশি রাখা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে ৫ জন করে মোট ১০ জন; বাকী ৫ বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে ১ জন করে মোট ৫ জন। সর্বমোট ১৫ জন চাকুরীদাতার মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এই সম্ভাব্য চাকুরীদাতাদের মতামত যাচাই করা হয়েছে মূলত বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের কীভাবে ভবিষ্যতে আরও যোগ্য ও দক্ষ করে তৈরি করা যায় সে বিষয়ে চাকুরীদাতাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়ার জন্য।

গবেষণার গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের আসল নাম, পরিচয়ও দেয়া হয়নি; শুধু পেশা কিংবা পেশাগত বিশেষ যোগ্যতার ধরন উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের একইভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের বিভাগ বা অনুষদের নামে। সব অংশগ্রহণকারীর কাছে এই গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ জানার পর যারা অংশগ্রহণের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছে, শুধু তারাই অংশ নিয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই গবেষণার ফলাফল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তাই এই গবেষণার ফলাফল এক কথায় সিম্পটোমেটিক; এই সূত্র ধরে আরও বিশদ গবেষণা করলেই কেবল বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

৩। গবেষণার ফলাফল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উচ্চ আশা ও আগ্রহ নিয়ে যাত্রা শুরু করে, কিন্তু ধীরে ধীরে তারা লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারাতে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং একসময় তাদের শিক্ষাজীবনের দুঃখজনক সমাপ্তি ঘটে। ভালো চাকরি ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের আশা তাদের আর থাকে না। পড়ালেখার প্রতি কেন তারা উল্লেখযোগ্যভাবে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই প্রবন্ধে শিক্ষা ব্যবস্থার মোটাদাগের সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য কিছু উপায় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধান প্রধান সমস্যার মধ্যে আছে শ্রেণিকক্ষের সমস্যা, পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব, ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় কোর্স ম্যাটেরিয়ালসের অভাব, গবেষণাগারে সরঞ্জামাদির অপর্যাপ্ততা, ক্যাম্পাসে দলীয় পাঠস্থানের অভাব, শিক্ষকদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও চাকরির সুযোগ-সুবিধার অভাব। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী পরশ বলেন:

> 'ছাত্রছাত্রীরা প্রথম বর্ষে ভালোভাবে লেখাপড়া করে। তারা কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত আসে। তারা শিক্ষকদের কথা বুঝতে চায়, কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষের পর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়। আমি দেখেছি, তবুও তারা পরীক্ষায় ভালো করে। এর কারণ হলো, দিনের বেলা চাকরি করলেও রাতে তারা লেখাপড়া করে। বন্ধুদের কাছ থেকে তারা নোট সংগ্রহ করে। গত ৪-৫ বছরের পরীক্ষার প্রশ্ন পড়লেই যথেষ্ট হয়। শুধু গত বছরের প্রশ্নগুলোর উত্তর পর্যালোচনা করে আমি তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষায় ৮০% প্রশ্ন কমন পেয়েছি।'

এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী অন্য একজন ছাত্র নয়ন এর সাথে যোগ করেন:

> 'প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে আসে। কলেজের পরিবেশ দেখার পর সবাই ভাবে, ক্লাস না করলে কিছুই হবে না। কেন তারা এমনটি ভাবে? এখন আমি আমার অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি। আমি ৭০-৮০% ক্লাস করেছি। আমি ক্লাসের ক্যাপ্টেন ছিলাম। আমার মাধ্যমে সকল নোট অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে সরবরাহ করা হতো। কেউ ক্লাসে না আসলে তাকে জরিমানা করা হতো। ঐ সময়ে ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি কিছুটা ভালো ছিল। ক্লাস করতে আমার ভালো লাগত, কিন্তু পরবর্তীকালে আমি দেখলাম, এসব নিয়মকানুন আর মানা হচ্ছে না।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ কেন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এখানে পদ্ধতিগত সমস্যার দিকে আলোকপাত করতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা যখন ক্লাস শুরুর অল্পদিন পর থেকে উপলব্ধি করতে থাকে, ডিগ্রী সম্পন্ন করা এবং এমনকি ভালো গ্রেড পাওয়ার জন্যও শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হওয়া ও লেখাপড়া করা জরুরি নয়। পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র ভালো করে দেখে উত্তর আত্মস্থ করলেই পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আন্তরিকভাবে লেখাপড়া না করে বরং বাজার থেকে গাইড বই কিনে পড়লেই ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। সমস্যাটির মূল বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির গভীরে গ্রহিত নিয়মনীতি কেবল মানার জন্য মেনে চললে হয়তো পরীক্ষায়

ভালো নম্বর পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে কি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সাধন হয়? সমস্যাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই চলমান শিক্ষার পদ্ধতিগত কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চাকরি বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভালোভাবে তৈরি করার লক্ষ্যে প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন কোর্সের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণের সীমাদ্ধতা থেকে শুরু করে আরও অনেক সমস্যার কথা এই নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.১। একাডেমিক ক্যালেন্ডার

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস, পরীক্ষা ও ফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করে সব ছাত্রছাত্রীর জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা সব সময় এ বিষয়ে ভালোভাবে অবগত থাকে না। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা এটিকে মূলত পরীক্ষার তারিখ জানার উৎস হিসেবে মনে করে। ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই অভিযোগ করে, কলেজ কর্তৃপক্ষ একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। এর প্রধান কারণ হলো নির্ধারিত সেশনে সিলেবাস শেষ করতে তারা সময় কম পায়; শিক্ষকদের দুপুরের আগেই ক্লাস নিতে হয়। বিকেল বেলায় শ্রেণীকক্ষগুলো প্রায়ই পরীক্ষার হল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে তারা দিনের অর্ধেক বেলা পড়ানোর সময় পায়। গাজীপুরের ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের শিক্ষক আলমাস হোসেন বলেন,

> 'আমাদের মাঝে মাঝে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করতে সমস্যা হয়। ক্লাসের জন্য আমরা কম সময় পাই। ক্লাস শুরুর তারিখ ও ফরম পূরণের সময়ের মধ্যে কম সময় পাওয়া যায়। আমরা সিলেবাস শেষ করতে পারি না।'

আরেকজন শিক্ষক সুনির্দিষ্ট করে বলেন, তাদের প্রায়ই ক্লাস মিটিংগুলো দুপুর ১২ টার মধ্যে শেষ করতে হয়। এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী কুমিল্লা সরকারি কলেজের জনৈক শিক্ষক বলেন:

> 'কিন্ত আমাদের অসুবিধা হলো, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো বিকালে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দুপুর ১২ টার আগে ক্লাস শেষ করতে হয়। কিন্তু তার পরে আমাদের নির্ধারিত ক্লাস থাকে। তখন আমাদের ঐ ক্লাসগুলো নিতে সমস্যা হয়।'

বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা বললেও তারা সাধারণত বিভাগ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার তৈরি করে না। বিভাগগুলোকে সাধারণ ছাড়াও তাদের নিজেদের মতো করে নিজেদের জন্য সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। বছরের শুরুতেই একটা কোর্স কয়দিন কীভাবে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে, তার কোনো পরিকল্পনা না থাকলে প্রথমেই তারা এই শিক্ষার কার্যকারিতা নিয়ে সন্দিহান হতে শুরু করে। শুরুতেই এই দ্বিধা নিয়ে যাত্রা করার ফলে শিক্ষার প্রতি তাদের যে মোহ তৈরি করা দরকার, তাতে একটা ছেদ পড়ে, তার একটা বড় ধরনের ব্যত্যয় হয়।

৩.২। ক্লাসের সংখ্যা

শিক্ষকেরা অভিযোগ করে বলেন, তারা কোর্স শেষ করার জন্য সময় কম পান। এর প্রধান কারণ হলো মাত্র অল্প কয়েকটি ক্লাস তারা নিতে পারেন। দীর্ঘ ভর্তি প্রক্রিয়ার কারণে শিক্ষকরা নির্ধারিত সময়ে ক্লাস শুরু করতে ব্যর্থ হন। কক্সবাজার সিটি কলেজে অনুষ্ঠিত এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী একজন শিক্ষক বলেন, 'আমাদের সেশন শুরু হয় জুলাই থেকে। কিন্তু অনেক সময় ব্যয় হয়ে যায় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য। আমরা মাত্র ৮ মাস সময় পাই।' শিক্ষকেরা স্পষ্টভাবেই বলেন, সঠিক সময়ে কোর্স শেষ করতে

প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লাস নেওয়ার যথেষ্ট সময় তারা সাধারণত পান না। মানিকগঞ্জের একটি কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক শাতিল আহমেদ বলেন:

> 'যে কয়দিন আমাদের কলেজ খোলা থাকে এবং যে কয়টি ক্লাস হয় তা কোর্স শেষ করার জন্য যথেষ্ট নয়; একটি কোর্স শেষ করার প্রয়োজনীয় সময়ের তিন ভাগের এক ভাগও নয়।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্লাস নেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে মূলত ক্লাস ছাড়া অন্যান্য জরুরি কাজে শ্রেণিকক্ষগুলো ব্যস্ত থাকার জন্য। এর দুটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো পর্যাপ্ত ক্লাসরুম ও শিক্ষকের অভাব; এই দুটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অনুচ্ছেদে। তার ওপর, কোনো একটি কোর্সে কয়টা ক্লাস নেয়া হবে বা সম্ভব হবে তা আগে থেকে বলা যায় না; একটা কারণ হলো, সঠিকভাবে কোর্স ডিজাইন করা সব সময় সম্ভব হয় না, আর হলেও বিদ্যমান নানা সীমাবদ্ধতার কারণে সেটা সারা বছর মেনে চলা হবে তাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

প্রথম এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক শিখর আহমেদ বলেন:

> 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি কোর্সের জন্য একটি পূর্ণ বছর বরাদ্দ রাখা হয়; ২য় বর্ষের জন্য ১ বছরের একটা কোর্স প্রণয়ন করা হয়; কিন্তু মাত্র ৬-৭ মাস ক্লাস নেওয়ার পর তারা পরীক্ষা নেয়। ফলে রেজাল্ট তৈরির সময়সহ সারা বছর লেগে যায়, কিন্তু মানসম্মত শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। আমাদের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তারা চাকরি পাচ্ছে না। এ কারণে আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে কিছু উন্নয়ন প্রয়োজন এবং পড়ালেখার জন্য তাদের পুরোপুরি এক বছর সময় প্রয়োজন।'

সারা দেশের শিক্ষিত তরুণ সমাজ বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা জীবন শেষে কাঙ্ক্ষিত চাকরি বা কর্মসংস্থান করতে না পারার হতাশা অনেক। এক গবেষণায় দেখা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণদের প্রায় ৬৬ শতাংশ বেকার বা কোনো কাজের সংস্থান করতে ব্যর্থ হয়েছে (Mahmud et al., 2021)।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই একমত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে বাৎসরিক পরীক্ষা নিতে চায় এবং তাড়াতাড়ি ফল প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু এসব কারণে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার গুণগতমানের দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারে না এবং পেশাগত চাহিদার ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তুতিও কম থাকে। শিক্ষকরা আরও বলেন যে, চাপের কারণে ছাত্রছাত্রীরা স্বল্প সময়ে ডিগ্রী সম্পন্ন করছে কিন্তু গুণগত শিক্ষা পাচ্ছে না, ভালো চাকরি পাওয়াতো অনেক দূরের বিষয়।

৩.৩। শিক্ষক সংকট এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাব

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত বাড়ছে। এটি সহজেই অনুমান করা যায়, গড়ে একজন শিক্ষকের জন্য কাম্য অনুপাতের অনেক বেশি শিক্ষার্থী। শিক্ষকরা প্রায়ই রুম ভর্তি ছাত্রদের পাঠদান করেন। বিভিন্ন কোর্সের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেডাগজিক্যাল প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষকদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ জরুরি (Islam, Ali, & Hasan, 2020)।

শিক্ষকদের অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। যদিও দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অনেক সময় শিক্ষকরা শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া নিয়ে কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াই শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য পেডাগজিক্যাল প্রশিক্ষণ বিশেষ প্রয়োজন হলেও বর্তমানে তার অভাব রয়েছে, বিশেষ করে কীভাবে একটা কোর্স পরিকল্পনা করবে, কোর্স উপকরণ কীভাবে তৈরি করবে, কীভাবে ছাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী পাঠদান নিশ্চিত করা হবে, কীভাবে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় ইত্যাদি। জনৈক শিক্ষক হতাশা ব্যক্ত করে বলেন:

> 'আমরা শ্রেণিকক্ষে যাই শিক্ষাদানের জন্য, আমাদের কোনো প্রস্তুতি নেই, আমরা জানি না কী পড়াব। শিক্ষার্থীদের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে কী করব। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে কী করে, সে বিষয়ে কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করেছে কি না, সে সম্পর্কে আমি জানি না।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা মেটানোর জন্য College Education Development Programme (CEDP) কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সিইডিপি) এর আওতায় সারা দেশে প্রায় ১,২০০ কলেজে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স করানো হয়েছে।[৫] এ সব প্রশিক্ষণ কর্মশালা কতটুকু কার্যকর তা নিয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে এই প্রোগ্রাম কিংবা অন্য কোনো প্রোগ্রামের আওতায় এ ধরনের প্রশিক্ষণের সংখ্যা ও মান উভয়ই বাড়ানোর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শিক্ষকেরা সম্মিলিতভাবে প্রশিক্ষণ সুযোগ সুবিধার অপর্যাপ্ততা বিষয়ে তাদের হতাশা ব্যক্ত করেন। জনৈক শিক্ষক বলেন, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কিছু প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা আছে। কিছু ক্ষেত্রে সরকার ক্যারিয়ারের শুরুতে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। শিক্ষকেরা বলেন, প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ বাড়ানো প্রয়োজন যাতে অধিক শিক্ষক যোগ দিতে পারে এবং নিজেদের গুণগত সেবা প্রদানের উপযোগী করে প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু ওসব সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল। অর্থনীতির জনৈক শিক্ষক বলেন:

> 'শিক্ষকদের গুণগতমান বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষণের আরও সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত। বিদেশে প্রশিক্ষণের আরও সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন। যদি আমরা বিদেশে শিক্ষাদান বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে আমরা জানতে পারব, কীভাবে তারা সিলেবাস প্রণয়ন করে, কীভাবে তারা ক্লাস নেয় এবং কীভাবে তারা শ্রেণিকক্ষে ক্লাস লেকচার দেয়।'

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের অবস্থা আরও নাজুক বলে মনে হয়। শিক্ষকরা বলেন, তারা যেসব কোর্স পড়ান সেগুলোর উপর সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ তারা পান না।

> 'আপনারা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কথা বলছেন। আমি একটা প্রশিক্ষণও পাইনি। ১৬ বছর হয়ে গেছে। আমি ২০০৩ সালে যোগ দিয়েছি, ২০০৩ সালের ২২ তম বিসিএস এ। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাইনি (দলীয় আলোচনা)।'

---

[৫] শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সিইডিপি ২য় ব্যাচ, ২০১৮, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট https://cedp.gov.bd/ teacher-training-cedp-2nd-batch-2018/(২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)।

মনন নামের আরেকজন শিক্ষক বলেন, 'আমি ২৪তম বিসিএস এ যোগদান করেছি, ১৫ বছর হলো। কিন্তু আমি কোর্সভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাইনি।' জনৈক অংশগ্রহণকারী বলেন, শিক্ষকদেরকে এমএড ও বিএড কোর্স করতে বলা হয়, কিন্তু কেন সুনির্দিষ্ট কোর্সভিত্তিক নয়, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ নয়। আরেকজন শিক্ষক বলেন, প্রথম শ্রেণি পাওয়া সত্ত্বেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই তাকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করেনি। শিক্ষকদের জন্য কোর্সভিত্তিক আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন। ভালো হয় যদি কোর্স প্রণয়নের উপর বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ থাকে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সহজ ও কার্যকর যোগাযোগ ঘটার সুযোগ তৈরি হয় এমন প্রশিক্ষণ থাকে। সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রদের জন্য ছাত্রবান্ধব শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

শিক্ষকরা তাদের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে বলেন, তারা প্রায়ই শিক্ষাদানের কাজে বেশি চাপে থাকেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা এইচএসসি থেকে সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে যুক্ত থাকেন। একজন সিনিয়র শিক্ষক জনাব মাহফুজ বলেন: যদি একজন শিক্ষক ৫-৬ টা ক্লাস নেন, তাহলে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের প্রায় সবাইকে নির্দিষ্ট বিষয়ের সব কোর্স পড়ানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। সে কারণে শিক্ষকদের কোনো নির্দিষ্ট কোর্স ভিত্তিক দক্ষতা তৈরি করার সুযোগ হয় না। সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের শিক্ষক রমা হক বলেছেন, একজন শিক্ষককে বছরে ৬ থেকে ৯ টা কোর্স পড়াতে হয় এবং ঢাকার বাইরের কলেজে এ সংখ্যা আরও বেশি। এতে করে কোনো একটা বিষয়ের উপর কারো বিশেষায়িত জ্ঞান বা দক্ষতা গড়ে উঠার সুযোগ কমে যায়। তার উপর নতুন নতুন কোর্স চালু হলে সেগুলোর উপর শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিলে তাঁরা পেশাগত দায়িত্ব পালনে অসুবিধায় পড়েন।

একটি কলেজে অনেক বেশি ডিগ্রী প্রোগ্রাম থাকা গুণগত শিক্ষাবান্ধব নয়। এইচএসসি ও স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দান করতে একই শিক্ষকদের রাখা বিশেষভাবে ঝুঁকির। সবার পক্ষে সব কোর্সে এবং সব পর্যায়ে ক্লাস নেয়ার জন্য সমান দক্ষতার সাথে প্রস্তুতি নেয়া এবং তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সহজ নাও হতে পারে।

> 'আমাদের কলেজে চারটি ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে: ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার্স। তাই আমাদের অনেক পরীক্ষা নিতে হয়, অতিরিক্ত কোর্স পড়াতে হয়। পরীক্ষার কারণে আমরা কমসংখ্যক ক্লাস নিতে পারি।'

সমস্যা হলো, সব স্তরের ছাত্রছাত্রীদের সমানভাবে যত্ন নিতে শিক্ষকেরা কম সময় পান। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে শিক্ষকদের প্রস্তুত করার সুযোগ সীমিত।

৩.৪। শ্রেণিকক্ষের সংকট

ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক উভয়েই শ্রেণিকক্ষের সংকটের কথা জানিয়েছেন। চারটি কারণে বিদ্যমান অধিকাংশ কক্ষগুলোতে ক্লাস নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

প্রথমত, শ্রেণিকক্ষগুলো বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর বসানোর ব্যবস্থা করার জন্য আকারে অনেক ছোট।

দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মকালে কক্ষগুলো এত গরম হয় যে আরামে বসা যায় না এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন মাইক্রোফোন বা প্রজেক্টর ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকে না, আর থাকলেও সব সময় সচল থাকে না বা পাওয়া যায় না।

চতুর্থত, এমনকি ইনস্ট্রুমেন্ট থাকলেও নিয়মিত লোডশেডিংয়ের কারণে ছাত্রছাত্রীরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারে না।

অবকাঠামোগত সমস্যা কতটা তীব্র ও বেদনাদায়ক তা খানিকটা টের পাওয়া যায় শিক্ষকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত দলীয় আলোচনায় উঠে আসা নিম্নোক্ত বক্তব্যে:

> 'আমাদের কক্ষ সংকট রয়েছে। একটা কক্ষকে আলাদা করা হয়েছে এবং দুটি বিভাগের সেমিনার করা হয়েছে। আমাদের অবকাঠামোগত সমস্যা আছে। আমাদের সুনির্দিষ্ট কক্ষ নেই। আমাদের হল রুম নেই। ইভেন্টগুলো শ্রেণিকক্ষেই অনুষ্ঠিত হয়। যদি একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, তাহলে শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চগুলো বের করে নেয়া হয় এবং অনুষ্ঠান শেষে আবার শ্রেণিকক্ষে আনা হয়।'

গরম আবহাওয়ায় ফ্যান ও এসি না থাকায় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকেরা সমানভাবে দুর্ভোগ পোহায়। সাহান নামের একজন শিক্ষক বলেন, ছাত্রছাত্রী ঠাসা কক্ষে লেকচার দেওয়া অনেক কষ্টকর। মানিকগঞ্জের একটি কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক হক বলেন:

> 'ধরুন, খুব গরম, আপনি ঘামছেন এবং আপনি তখন পড়াচ্ছেন সাহিত্য ও সমালোচনা কিংবা এ ধরনের কিছু। যখন আপনি ক্ষুধার্ত এবং ঘামছেন, তখন যদি জগতের সেরা লেখাগুলো আলোচনা করেন, সে নিতে পারবে না। সেটা গুরুত্বপূর্ণ যতই হোক না কেন। আপনার শরীর সেটি গ্রহণ করবে না, মন ওটা নিবে না। একটা পরিবেশ থাকতে হবে। ছাত্রদের স্বাগত জানানোর পরিস্থিতি থাকতে হবে। সে অনুযায়ী শিক্ষকদেরও প্রস্তুত হতে হবে।'

পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষের অভাব ছাড়াও কলেজগুলোতে প্রায়ই বড় হল রুম কিংবা সম্মেলন কক্ষ নেই। কলেজগুলোকে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির আয়োজন করতে চাপ দেওয়া হয়। অন্য একজন শিক্ষক বলেন:

> 'আমাদের হলরুম নেই। আজ একটা প্রোগ্রাম হলো শ্রেণিকক্ষে। যদি কোনো প্রোগ্রাম থাকে তাহলে আমাদের টেবিল ভিতর-বাহির করতে হয়। আমাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটা হল রুম প্রয়োজন। আমাদের অবকাঠামোগত সংকট নিরসন করা প্রয়োজন।'

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ সুলভ করে তুলতে হবে। শ্রেণিকক্ষগুলোকে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, প্রযুক্তি যেমন-মাইক্রোফোন, লাউড স্পিকার এবং যথাযথ অডিও-ভিজ্যুয়াল ডিভাইস যোগে সুসজ্জিত করতে হবে। সব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি শুধু থাকলেই হবে না, সেগুলো নিয়মিত সচল রাখা, সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সেসব ইন্সট্রুমেন্ট শিক্ষার্থীরা যেন সমভাবে ও চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, আর তা না হলে শিক্ষার গুণগত মান রক্ষার প্রশ্ন অনেকটাই অধরা রয়ে যাবে।

৩.৫। লাইব্রেরি

অধিকাংশ কলেজের লাইব্রেরিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রসদের ভীষণ অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক রেফারেন্স বই ও জার্নালের সংকট রয়েছে; এ ছাড়া লাইব্রেরিগুলো নীরবে পড়ালেখা করার জন্য ভালো স্থান নয়। লাইব্রেরিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্প সংখ্যক বই থাকে। শত শত ছাত্রছাত্রী কখনোই তাদের দরকারি বই পায় না, সেগুলো যত্ন ও মনোযোগের সাথে পড়ার কথা অনেক দূরের ব্যাপার। এটি শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরিতে পড়তে না যাওয়ার একটি কারণ। তারা ভালোভাবে জানে, হয় লাইব্রেরিতে বই নেই কিংবা যখন প্রয়োজন তখন তারা সেখানে যেতে পারে না। লাইব্রেরিতে অনেক সময় লাইব্রেরিয়ানও থাকে না।

বিশ্বমানের লাইব্রেরিগুলোতে যেখানে শিক্ষার্থীরা ২৪ ঘণ্টার যেকোনো সময় তাদের প্রয়োজনীয় রসদ অনলাইনে যুগিয়ে নিতে পারেন, সেখানে বাংলাদেশে কলেজ লাইব্রেরি মাঝে মাঝে খোলা থাকে! লাইব্রেরি শুধু খোলা থাকলেই হয় না, প্রতিটি লাইব্রেরিতে একজন বিষয়ভিত্তিক এক্সপার্ট থাকতে হয়, যাতে তিনি শিক্ষার্থীদের চাহিদামতো বই-জার্নাল-মনোগ্রাফ ইত্যাদির খোঁজ দিতে পারেন। বর্তমানে সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ বলা যায়, মানসম্মত লেখাপড়ার একটি জরুরি অনুষঙ্গই বিকল।

কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক মোজাম্মেল হোসেন বলেন:

> 'অনেক রিসোর্স থাকলেও লাইব্রেরিতে রেফারেন্স বই পাওয়া যায় না বললেই চলে। যদিও বাংলাদেশি লেখকদের বই পাওয়া যায়, বিদেশি/আন্তর্জাতিক লেখকদের বই পাওয়া যায় না। যেহেতু আমাদের প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ রয়েছে, সেহেতু আমরা কিছু বই পাই, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা পায় না। আমি মনে করি, বই পড়া ছাড়াও যদি ভিডিও ও ডকুমেন্টারি দেখানো হয় তবে ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরি ব্যবহারে আগ্রহী হবে। ছাত্রছাত্রীরা গাইড বই পছন্দ করে। তাই তারা রেফারেন্স থাকা সত্ত্বেও বইয়ের প্রতি উদাসীন থাকে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য লাইব্রেরি থেকে বই তোলার সুযোগ আছে। তারা রেফারেন্স বই পড়তে জড়তা বোধ করে কারণ যত্রতত্র গাইড বইগুলো পাওয়া যায়।'

লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বইপত্র থাকা উচ্চ শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তা না থাকলে একজন শিক্ষার্থী কী নিয়ে তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে বিচরণ করবে, কীভাবে তারা জ্ঞানের রাজ্যে নিমজ্জিত হবে, কীভাবে তারা বিশ্বমানের জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে নিজেদের পরিচিত করবে, কীভাবে নিজেরাও সে ধরনের মানসম্মত জ্ঞানবিজ্ঞান তৈরির কারিগর হবেন বা হওয়ার স্বপ্ন দেখবেন?

আরেকটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো, লাইব্রেরি খোলা থাকার সময়। অফিস সময়ে লাইব্রেরি খোলা থাকলে শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। আরও দু:খজনক বিষয় হলো, অধিকাংশ লাইব্রেরিই বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লাইব্রেরিগুলো অফিস সময়েও খোলা থাকে না। ক্লাস চলাকালে লাইব্রেরিগুলো খোলা থাকে। ধরে নেওয়া হয়, ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হবে এবং পড়াশোনা করবে। কিন্তু তারা যদি লাইব্রেরির রিসোর্সগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে চায়, তাহলে ক্লাস সময়ের পর সন্ধ্যাবেলায় কিংবা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে লাইব্রেরিতে প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধাজনক সময়ে লাইব্রেরিতে বই, ডকুমেন্ট, জার্নাল ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ্ঞানের রসদ যোগাতে শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়তই অপারগ হলে শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি তাদের আগ্রহ কিংবা কমিটমেন্ট থাকবে তা আশা করা যায় না। যখন অনুসন্ধিৎসু মন জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণের পর্যাপ্ত পরিসর খুঁজে পাবে না, তখন জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার যে স্বপ্ন দেশের নীতিনির্ধারক মহলে বিরাজ করে, তা আকাশকুসুম কল্পনায় পর্যবসিত হওয়ার পথে অগ্রসর হয়।

৩.৬। কোর্স ম্যাটেরিয়াল ও ইন্টারনেট সুবিধা

কোর্স উপকরণ ও বিষয়বস্তু হালনাগাদ রাখা অতীব জরুরি। কোর্সের বিষয়বস্তু ও ম্যাটেরিয়ালগুলো জরুরি ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কেই সাম্প্রতিক ও কার্যকরি কোর্স কনটেন্ট অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তায় জোর দিতে হবে। গণিত তৃতীয় বর্ষের একজন শিক্ষার্থী হাসিব বলেন:

> 'আমাদের দ্বিতীয় বর্ষে গণিত কোর্স আছে। এটির নাম ফোরট্রান। এটি কম্পিউটারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যরা পাইথন কিংবা সি++ পড়ে, কিন্তু আমরা ১৯০০ সালে ব্যবহৃত ফোরট্রান ব্যবহার করছি। আমাদের সময়ে এর ব্যবহার নেই। আমরা জানি না, এগুলো আদৌ কতটা প্রয়োজনীয় হবে আমাদের ব্যবহারিক জগতে।'

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, ছাত্ররা বাজারে লভ্য গাইড বইয়ের উপর প্রায়ই নির্ভর করে। যেহেতু টেক্সট বইগুলো লাইব্রেরিতে প্রায়ই পাওয়া যায় না এবং সব সময় বাজার থেকে এসব দামী বই কিনতে পারে না, সেহেতু অন্য বিকল্প উপায়ে সেগুলো সংগ্রহ করা হয় না। কম দাম বা সামর্থ্যের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ থাকাটা যেমন জরুরি, সেই উপকরণ যথার্থভাবে ব্যবহারের সুযোগ সবার জন্য অবারিত করাও সমান জরুরি।

সিলেবাসের অংশ হিসেবে, ছাত্রছাত্রীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোতে ব্যবহারিক কাজ করার সুযোগ থাকতে হবে। শিক্ষকেরা তাদের প্রজেক্ট জমা দিতে বললে তারা আগের প্রজেক্টগুলো কপি করে জমা দেয়। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন নকল প্রতিরোধে সহায়ক সফটওয়্যার ব্যবহার করে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখতে সচেষ্ট হওয়ার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ভাবা উচিত। যশোর এম এম কলেজের ছাত্র তিতাস বলেন, বাস্তব জগতে দক্ষ হওয়ার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তাদের নেই। মৌলিক ইনস্ট্রুমেন্টের অভাব (যেমন-ল্যাবরেটরীতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের অভাব) ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক উপায়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও পরীক্ষা সম্পাদনে নিরুৎসাহিত করে।

গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়মিত ব্যবহার না করতে পারলে গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ কেবল থাকলেই হবে না, সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার থাকতে হবে, আর তা না হলে উচ্চশিক্ষার সংস্কৃতি বিকশিত হয় না। শিক্ষার্থীদের গবেষণার হাতেখড়ি যেহেতু গবেষণাগারে হয়, সেহেতু যথেষ্ট পরিমাণে ও মানসম্মত সরঞ্জামাদির অভাব শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সক্ষম হয় না।

কলেজ প্রাঙ্গণে ইন্টারনেট ব্যবহারের যে সুবিধা রয়েছে, তা সন্তোষজনক নয়। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সুনির্দিষ্ট সাইট নেই যেখান থেকে তারা প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়ালস, যেমন বই, জার্নাল আর্টিকেল কিংবা প্রজেক্টস, ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে অনলাইনের মাধ্যমে সর্বদা কোর্স ম্যাটেরিয়ালস পেতে পারে (বিশেষ করে লাইব্রেরি থেকে) সে ব্যবস্থা থাকা উচিত। বর্তমানে বেশির

ভাগ প্রতিষ্ঠানেই সে ব্যবস্থা নেই। ভাওয়াল বদরে আলম কলেজের শিক্ষক কনক চক্রবর্তী অভিযোগ করে বলেন:

> 'কলেজ ক্যাম্পাসে যে ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যায় তা যথেষ্ট। কিন্তু ইন্টারনেটের গতি সীমিত। আমরা ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধির চেষ্টা করছি। লাইব্রেরির পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলে ইন্টারনেট সুবিধা আছে। কিন্তু ক্যাম্পাসে ইন্টারনেট ব্যবহার সীমিত। বিকাল ৫ টায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই সুবিধা চালু করি, কারণ আমরা তাদের শ্রেণিকক্ষমুখী করতে চাই। আমরা যদি ওয়াইফাই সুবিধা সব সময় উন্মুক্ত রাখি, তাহলে তারা শ্রেণিকক্ষমুখী হবে না।'

ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারনেট সুবিধার বিচক্ষণ ব্যবহার করবে কি না, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইন্টারনেট সুবিধার উন্মুক্ত ব্যবহার ক্ষতিকর হবে নাকি হিতে বিপরীত হবে, তা ভাবনার বিষয়। এটি সুস্পষ্ট, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক উভয়েরই উচ্চ গতির ইন্টারনেট সুবিধা থাকা উচিত। গুটিকয়েক লোকের সম্ভাব্য অপব্যবহারের আশঙ্কায় সব শিক্ষার্থীকে জরুরি ইন্টারনেট সেবা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা কোনোভাবেই সমীচীন হবে না।

৩.৭। সেমিনার কক্ষ ও দলীয় অধ্যয়নের স্থান

রিসোর্স সমৃদ্ধ লাইব্রেরির অভাব ছাড়াও কলেজে দলীয় পাঠ ও আলোচনার নির্ধারিত জায়গা নেই। যে সকল কলেজ প্রতিনিয়ত শ্রেণিকক্ষের সংকটে ভোগে, তারা দলীয় আলোচনার জন্য সংরক্ষিত কক্ষ রাখার কথা চিন্তাও করতে পারে না। অল্প যে কয়েকটি কলেজে সেমিনার কক্ষ আছে, সেগুলো শিক্ষার্থীদের আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ হতে পারে, শিক্ষার ব্যবহারিক গুরুত্ব উপলব্ধির অভাব। মানিকগঞ্জের একটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক জাহান হোসেন বলেন:

> 'পাঠের জন্য সেমিনার কক্ষ নেই। রুম বড় হলে ২-৩ টা দল একসাথে বসতে পারে। একটি খালি রুম প্রয়োজন। আমাদের সেমিনার রুম রয়েছে কিন্তু ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের কোনো আগ্রহ নেই। আমি জানি না, কেন তাদের আগ্রহ নেই।'

কলেজের লাইব্রেরিগুলোতে যথেষ্ট সংখ্যক বই কিংবা রিসোর্স নেই; দুর্গম এলাকায় এই সংকট আরও ভয়াবহ। শিক্ষকেরা স্বীকার করেন, রিসোর্স, জায়গার সংকট ও লাইব্রেরিতে যথাযথ পরিবেশের অভাব ছাত্রছাত্রীদের লাইব্রেরি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করে। ফরিদপুরের একটি কলেজের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের জনৈক শিক্ষক বলেন:

> 'আমাদের লাইব্রেরি এক কক্ষের, যেখানে অল্প কয়েকটি বই পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে অনার্সের ছাত্রদের পড়ার যথাযথ পরিবেশ নেই। আমরা তাদের সেরকম পরিবেশ দিতে পারছি না। একাকী পড়ার পরিবেশ নেই। কিছু বেঞ্চ আছে যেখানে ৪/৫ জন একসাথে বসে পড়তে পারে। আমরা ছাত্রছাত্রীদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়েছি। তারা সেখানে পড়ার ভালো পরিবেশ পেয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীদের পড়তে উৎসাহিত করা।'

কিছু কিছু কলেজে দলীয় পাঠের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে, কিন্তু সেই জায়গা সব সময় আকারে বড় নয় যে একসাথে অনেক ছাত্র সেখানে বসতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভাগীয় সেমিনারগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠের জন্য কয়েকটি কক্ষ রয়েছে, কিন্তু ঐ কক্ষগুলো এত ছোট যে একসাথে বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জায়গার সংকুলান হয় না। অর্থনীতির জনৈক শিক্ষক বলেন:

> 'কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে আমাদের গ্রুপ স্টাডি বা একা পড়ার সুযোগ সুবিধা রয়েছে, কিন্তু বিভাগে নেই। আমাদের বিভাগে ১ম বর্ষ থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত প্রায় ৬০০ ছাত্রছাত্রী, তাদের সবাই সেখানে পড়ালেখা করে, যদি একটা বড় লাইব্রেরি থাকত, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হতো।'

উচ্চ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মতামত বিনিময়, জ্ঞানের নানাবিধ বিষয় নিয়ে খোলা মনে আলোচনা ও সমালোচনা করা। এই মুক্তবুদ্ধির চর্চার অন্যতম কাঠামোগত শর্ত হলো মুক্ত আলোচনা করার সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করা। এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি ও তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলো অনেক পিছিয়ে আছে।

৩.৮। পরীক্ষার হল ও পরীক্ষা পদ্ধতি

ছাত্র শিক্ষক উভয়েই শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতার কথা জোরালোভাবে বলেছে। সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করে পরীক্ষার সময়। ছাত্রছাত্রীদের পূর্ব-নির্ধারিত পরীক্ষার কারণেও কলেজে নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের সংকট দেখা দেয়, আগেই তা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কেবল পরীক্ষার জন্য আলাদা কক্ষ নির্মাণ করে এই সংকট নিরসন করা যায়। পরীক্ষার হল প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত, যাতে পরীক্ষার কারণে ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়মিত ক্লাস মিস করতে না হয়। আলাদা পরীক্ষার হল কাঙ্ক্ষিত নীরবতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য ভালো। প্রত্যেক কলেজেরই পরীক্ষার জন্য আলাদা ভবন নির্মাণ করা উচিত। তা করা গেলে পরীক্ষা চলাকালে উদ্ভূত যেকোনো বিশৃঙ্খলা এড়ানোর স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে। অন্যান্য ভবন থেকে পরীক্ষা কক্ষ বা ভবন আলাদা রাখা উচিত যাতে জরুরি সংকটকালে যেমন ধর্মঘটের সময় পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ভবন নিরাপদ রাখা যায়।

ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাকে গুরুত্ব সহকারে নেয় না, কারণ যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অনুমান করা যায়। ছাত্র শিক্ষক উভয়ই দাবি করেন, তারা বাজারে পাওয়া যায় এরূপ বই পড়ে পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যায়। আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, ছাত্ররা বলেন, পুরানো প্রশ্নগুলোই পরীক্ষায় পুনরাবৃত্তি হয়। রংপুর সরকারি কলেজের জনৈক শিক্ষক বলেন:

> 'যদি আপনি গত ২-৩ বছরের প্রশ্ন দেখে যান, তবে আপনি ১০০% প্রশ্ন কমন পাবেন। এই কারণে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। প্রশ্নপত্র করার নতুন উপায় দরকার। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা বই পড়তে উৎসাহিত হবে। যেহেতু ছাত্রছাত্রীরা ধরাবাঁধা প্রশ্ন পায়, সেহেতু মূল বই পড়তে চায় না।'

পরীক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন তাহলে তা হতে হবে যথার্থ; আগের বছরের প্রশ্ন দেখে যদি পরীক্ষায় পাশ করা যায় তাহলে আর যাই হোক উচ্চশিক্ষা হয় না, মানসম্মত ও মননশীল প্রশ্ন অনেকটাই এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আর পরীক্ষার প্রশ্ন যেহেতু বাজারের গাইডে পাওয়া যায়, তাই তারা ক্লাসে আসতে চায় না। ক্লাসের আলোচনায় মনোযোগ দিতে চায় না। ক্লাসের আলোচনা যদি মূল বইয়ের

পাশাপাশি বাস্তব জীবনের সাথে সঙ্গতি রেখে করা হয়, ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা হয়তো নিজে থেকেই আগ্রহী হবে। সকল বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে তা সমানভাবে সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে একথা সত্য। পুরানো প্রশ্নপত্রের পুনরাবৃত্তি হওয়ার প্রবণতা বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন। গবেষণায় দেখানো উচিত সুনির্দিষ্ট কোনো বিভাগ আছে কি না, যেখানে অন্যদের তুলনায় গতানুগতিক প্রশ্নপত্রের পুনরাবৃত্তি বেশি করা হয়। যদি তাই হয় তাহলে গবেষকদের খুঁজে বের করা দরকার, তেমনটি কেন ঘটে এবং কীভাবে তা প্রতিরোধ করা যায়।

দুটি বিষয় এখানে খুব ক্ষতিকর। প্রথমত, ছাত্রছাত্রীরা যদি পরীক্ষাকে পরীক্ষা মনে না করে এবং নিয়মিত পড়াশোনা না করে, তাহলে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ফল হতাশব্যাঞ্জক হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, ছাত্রছাত্রীরা যদি ক্লাসকে আন্তরিকভাবে না নেয় এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকা গুরুত্বপূর্ণ না ভাবে, তাহলে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীরা কেন বর্তমান ব্যবস্থায় আগ্রহ হারাচ্ছে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, কীভাবে তাদের ঐ আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায় সেটা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।

৩.৯। ল্যাবরেটরি

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সুসজ্জিত ক্লাসরুম ও কার্যকর ল্যাবরেটরি থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Tsinidou, Gerogiannis, & Fitsilis, 2010)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই অভিযোগ করেন, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালো ল্যাবরেটরি নেই। কোথাও কোথাও ল্যাবরেটরির জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ থাকলেও সরঞ্জাম নেই কিংবা ঐসব কক্ষে সুযোগ-সুবিধা নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান ল্যাবরেটরিগুলোতে পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি নেই, ইনস্ট্রাকটরও নেই। কক্সবাজার সিটি কলেজের জনৈক শিক্ষক বলেন:

> 'ল্যাবে ইন্টারনেটের গতি খুব কম। কম্পিউটারের সংখ্যাও খুব কম। ল্যাবে পর্যাপ্ত ডেমোনেস্ট্রেটরেরও প্রয়োজন রয়েছে।'

পর্যাপ্ত যন্ত্রাংশের অভাবে শিক্ষার্থীরা ল্যাবরেটরিগুলোকে উপযোগী বলে মনে করে না। শিক্ষকেরা বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের ল্যাবরেটরি ব্যবহারে উৎসাহিত করলেও অপরিপূর্ণ ল্যাবরেটরি ছাত্র ও শিক্ষকদের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। সর্বোপরি, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সেশনগুলো পরীক্ষার পর অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের একজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন:

> 'আসলে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হয় পরীক্ষার এক সপ্তাহ বা ১০ দিন পরে এবং তারপর আমাদের প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা হয়। আসলে প্র্যাকটিক্যাল সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই।'

যে সকল ছাত্রছাত্রী ল্যাবরেটরি ব্যবহার করে তারা পরীক্ষা পাসের জন্য করে। তার বাইরে অর্থপূর্ণ ল্যাব বা কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ থাকে না। ল্যাবরেটরির কক্ষগুলো এত সংকীর্ণ যে একসাথে অনেকের সংকুলান হয় না।

উচ্চশিক্ষার আঁতুড়ঘর হচ্ছে গবেষণাগার; সেই গবেষণাগারের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুম সংকট, শিক্ষক সংকট ও অপর্যাপ্ত লাইব্রেরির পাশাপাশি ল্যাবরেটরির করুণ দশা যেন *একে অপরের দীনতার সারথি*। দীনতার দরিয়ায় কেউ কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই। সংকটের এই দরিয়ায় তাই শিক্ষার্থীরা নিত্য হাবুডুবু খাচ্ছে।

৩.১০। কর্মসংস্থান

নিয়োগকারীরা সাধারণত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের গুণগতমানে সন্তুষ্ট নয়। তারা মনে করে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকেরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে গড় গুণগতমানের দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। বেসরকারি খাতের জনৈক সম্ভাব্য চাকুরিদাতা মনে করেন যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের গুণগতমান অনেক সময় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীদের গুণগতমানের চেয়েও অনেক খারাপ। শিক্ষকতার গুণগতমান ছাড়াও নিয়োগকারীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের মধ্যে ব্যবহারিক ও যোগাযোগ দক্ষতার অভাব লক্ষ করেছেন। সম্ভাব্য চাকুরিদাতারা মনে করেন আইসিটি দক্ষতা সমসাময়িক বিশ্বে অতি প্রয়োজনীয়, যেমন চট্টগ্রামের প্রাইম ব্যাংকের কর্মকর্তা শায়ান হোসেন বলেন:

> 'কিছু কিছু বিশেষ দক্ষতা আছে যা চাকরি প্রত্যাশীদের থাকা উচিত। একটি বিশেষ দক্ষতাই যথেষ্ট নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকতেই হবে। কম্পিউটারে দক্ষতা বর্তমান প্রযুক্তিগত বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণও বটে। কম্পিউটারের দক্ষতা ছাড়া কিছুই করা যাবে না। ইংরেজির ব্যবহার যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাদের লেখার দক্ষতা থাকতে হবে। জনগণের সাথে মেশার পাশাপাশি কথা বলার দক্ষতাও থাকতে হবে।'

কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের প্রতি নিয়োগকারীদের পরামর্শ হলো, মানুষের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং টিমওয়ার্ক দক্ষতা বাড়ানো। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, যাতে সম্ভাব্য নিয়োগকারীদের সাথে ছাত্রছাত্রীরা যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে পারে।

চাকরি বাজারে ভালো করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দুটি বিশেষ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া দরকার: ইন্টার্নশিপ ও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। বর্তমানে যার যার বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ করার সুযোগ-সুবিধার স্বীকৃত পদ্ধতি নেই বললেই চলে। পেশাগত ক্ষেত্রে হাতে কলমে প্রশিক্ষণেরও যথেষ্ট সুযোগ নেই। ছাত্র ও শিক্ষকেরা সবাই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ভুলে গিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কলেজ কর্তৃপক্ষের উচিত, সরকারের সহযোগিতা নিয়ে সম্ভাব্য চাকুরিদাতাদের সাথে সমন্বয় সাধনের স্থায়ী ব্যবস্থা করা।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের অ্যাল্যামনাই অ্যাসোসিয়েশন নেই। সুনির্দিষ্ট কলেজগুলো আলাদা অ্যাসোসিয়েশন গঠন করতে পারে। স্নাতকদের মধ্যে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করা তিনটি কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, কর্মসংস্থান খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ইন্টার্নশিপ কিংবা

প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা খুঁজে বের করা। তৃতীয়ত, পেশাগত উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজের সাথে একাডেমিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রয়োজনীয়তার ভারসাম্য কীভাবে স্থাপন করা যায়, সে বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো।

৩.১১। এক দশকের খতিয়ান

Alam et al., ২০১৪ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে খতিয়ান দিয়েছেন, বলা যায় ২০২২ সালের দিকেও তার কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। দু-একটি বিষয় ব্যতিক্রম: নিয়মিত পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশ করা। সময়মতো পরীক্ষা নেয়া আর ফল প্রকাশ করা জরুরি। তার চাইতেও কম জরুরি নয় শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে চালু রাখার জন্য মৌলিক অনুষঙ্গ ঠিক রাখা, যেমন, নিয়মিত ক্লাস নেয়া, পরীক্ষা নেয়ার জন্য যেন ক্লাস বন্ধ রাখতে না হয় সে ব্যবস্থা করা, শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীদের জন্য সুলভ করা। যে কথা গবেষকরা বলে গেছেন প্রায় এক দশক আগে, বলতে গেলে, একই কথা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আজও প্রযোজ্য। ২০১৪ সালে তারা বলেছেন:

> 'বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয় কোর্স কারিকুলাম ও পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে। কিন্তু যে উপায়ে তা করা হয় তা পুরানো এবং সব সময় ঠিকঠাক বাস্তবায়ন করা হয় না। একুশ শতকের শিক্ষার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের চাহিদা পূরণের জন্য দরকার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন' (Alam et al., 2014:299)।

৪। কার জন্য ও কেন উচ্চশিক্ষা?

মোটাদাগে, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য দুই ধরনের: বাজারের উপযোগী দক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদা মেটানো আর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও গবেষক তৈরি করা (Green, 1994)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আপাতদৃষ্টিতে এই দুই উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করছে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এ দুটি উদ্দেশ্যের কোনোটাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হাল আমলে সন্তোষজনকভাবে করতে পারছে বলে মনে হয় না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে কেন এত দুর্দশায়? এই প্রতিষ্ঠান তাহলে কিসের শিকার? এটা কি পারফরমেন্স সন্ত্রাসের বা 'terrors of performativity'-র শিকার (Ball, 2003)? নাকি এই রোগের নাম অনুসন্ধিৎসু, তীক্ষ্ণ ও দূরদর্শী মননের অভাব বা the absence of critical pedagogy (Ball & Collet-Sabé, 2021)। এককথায়, এর উত্তর সম্ভবত কোনোটাই নয়। কারণ তথাকথিত পারফরমেন্সের বিচারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র হতাশাজনক (Mahmud et al., 2021)। পারফরমেন্সের দৌড়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে পড়ছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বরং পারফরমেন্স বাড়াতে গিয়ে শুধু পরীক্ষা নেয়া আর ফল প্রকাশের মাঝে বন্দী হয়ে থাকা এই প্রতিষ্ঠানটি আদৌ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠার সম্ভাবনা ধরে রাখতে পারছে কি না, সে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, একটি বিশ্ববিদ্যালয় যদি জ্ঞান জগতে মৌলিক অবদান রাখার জন্য অপরিহার্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে, তাহলে সে প্রতিষ্ঠান কেবল টিকে থাকে নামে, কর্মে বা মর্মে নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে তাই মর্মের বিচারে মুমূর্ষু!

উন্নয়নের জন্য উচ্চশিক্ষা নয়, দরকার প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা - এ ধরনের কিছু ক্ষতিকর ভাবনা সমাজে বিরাজ করে (Tilak, 2015)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারক মহল যদি এই ধরনের ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের জন্য দুইটি বড় ধরনের বিপর্যয় আসন্ন। প্রথমত, পলিটেকনিক কলেজ বা টেকনিক্যাল সেন্টার হিসেবে দেশের যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সুউচ্চ আসন (অন্তত নামে) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করে, তার প্রতি কেবল অবিচার করা হবে না বরং উচ্চশিক্ষার প্রতি জনমনে এক বিপজ্জনক উন্নাসিকতা তৈরি হতে পারে। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন বলতে শুধু আয়ের উৎস তৈরি করে নিরেট জীবের জীবনযাপন করার যে চর্চা, তার সাথে যদি তাল মিলিয়ে চলার গন্তব্য স্থির করা হয়, তাহলে তা জাতির জন্য অশনি সংকেত! আর তাই যদি হয়, তাহলে শুধু আজকের নয়, আগামী দিনের এমনকি স্বপ্নের বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের জন্য বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উচ্চশিক্ষা শুধু দুরাশা নয়, নিরাশা হয়ে উঠবে।

৫। শেষ কথা

বিদ্যমান এই বাস্তবতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে, এই প্রশ্ন অবান্তর; বরং বাস্তবতা হচ্ছে, এই ঘুরে দাঁড়ানো অপরিহার্য, অনিবার্য। জরুরি জিজ্ঞাসা, কীভাবে এই ঘুরে দাঁড়ানো ত্বরান্বিত করা যায়? কীভাবে একে একটি দারুণ গণপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায়? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবতা দেখে মনে হতে পারে, এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে অকূল পাথারে ভাসছে, কিন্তু এই অকূল পাথারের এক ভিন্ন অর্থও হতে পারে। যার আছে অমিত, অসীম সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা বাস্তব রূপ দেবার জন্য প্রয়োজন দূরদর্শী পরিকল্পনা ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বিবেচনার দাবি রাখে।

সুপারিশমালা:

ক. শ্রেণিকক্ষ ও লাইব্রেরির জন্য জরুরিভিত্তিতে নতুন ভবন বা কক্ষ নির্মাণ করা

খ. পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ এবং নিয়মিতভাবে তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা

গ. কোর্স ম্যাটেরিয়াল জরুরি ভিত্তিতে হালনাগাদ করা

ঘ. শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, অডিও-ভিজ্যুয়াল এবং ফ্যান/এসির ব্যবস্থা করা

ঙ. স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল নির্মাণ করা

চ. লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নতুন বই-পত্র, জার্নাল নিয়মিত সরবরাহ করা

ছ. লাইব্রেরি খোলা রাখার সময় বাড়ানো, প্রয়োজনে সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং পরীক্ষা চলাকালে ২৪ ঘণ্টা লাইব্রেরি খোলা রাখার ব্যবস্থা করা

জ. প্রত্যেক কলেজে নিয়মিত চাকুরি মেলার আয়োজন করা

ঝ. কর্মসংস্থান উপযোগী কোর্স প্রণয়নে গুরুত্বারোপ করা

ঞ. বর্ষসেরা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী নির্বাচনের নিমিত্তে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার চালু করা

ট. বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন/গ্রেড করার ব্যবস্থা করা

ঠ. শুধু সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা করা

ড. গবেষণা ও ল্যাবের উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া

গ্রন্থপঞ্জি

Alam, G. M., Mishra, P. K., & Shahjamal, M. M. (2014). Quality assurance strategies for affiliated institutions of HE: A case study of the affiliates under National University of Bangladesh. *Higher Education*, *68*(2), 285-301.

Ball, S., & Collet-Sabe, J. (2021). Against school: An epistemological critique. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 1-15.

Ball, S. J. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. *Journal of Education Policy*, *18*(2), 215-228

Green, D. (1994). *What is quality in higher education?* Bristol, PA: Taylor & Francis.

Hossain, M. M., Islam, M. J., Biswas, B., & Hossain, M. K. (2017). The impact of students socioeconomic condition on academic performance in public and national university of Bangladesh. *Asian Research Journal of Mathematics*, *7*(3), 1-16.

Islam, A., Ali, M., & Hasan, N. (2020). Impact of training program on self-efficacy: An empirical study on the faculty members of universities in Bangladesh. *World Journal of Vocational Education and Training*, *2*(1), 37–45. https://doi.org/ 10.18488/journal.119.2020.21.37.45

Mahmud, M., Chowdhury, T. T., Adib, A., Nasrullah, Z. M., Bashar, M. T. I., & Akram, R. (2021). Tracer study on graduates of tertiary level colleges. Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

Mahmud, M., Mozumder, G. N., Shahana, S., Islam, S., & Akram, R., & Latif, S. A. (2019). Baseline satisfaction survey of the college development project (CEDP). Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

Tilak, J. B. (2015). Higher education in South Asia: Crisis and challenges. *Social Scientist*, *43*(1/2), 43-59.

Tsinidou, M., Gerogiannis, V., and Fitsilis, P. (2010). Evaluation of the factors that determine quality in higher education: An empirical study. *Quality Assurance in Education*, *18*(3), 227-244. https://doi.org/10.1108/096848810 11058669